أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 106) www.motaher21.net

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم

"সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

" He it is Who created for you all."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ২৯

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

২৯ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে “لَكُمْ” ‘তোমাদের জন্য’এর দ্বারা পৃথিবীর সকল বস্তু মানুষের উপকার ও উপভোগের জন্য সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত প্রমাণ করে সকল বস্তুর মূল অবস্থা বা বিধান হল হালাল বা বৈধ। কেননা তা অনুগ্রহের স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা হারাম বস্তুগুলো বের হয়ে গেছে। এখানে আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা‘আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারার্থে। অতএব যার ভিতরে ক্ষতি ও অপকার রয়েছে তা এর বাইরে।

(ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَي السَّمَآءِ)

“অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন” ইসতিওয়া শব্দটি কুরআনুল কারীমে তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:

১. ইসতিওয়া শব্দটি যখন কোন অব্যয়-এর সাথে ব্যবহার হবে না তখন এর অর্থ হবে পরিপূর্ণতা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন;

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰي)

“যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল।”(সূরা কাসাস ২৮:১৮)

২. ইসতিওয়া শব্দটি যখন “علي”অব্যয়-এর সাথে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে ওপরে ওঠা, সমুন্নত হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(الرَّحْمٰنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوٰي)

“দয়াময় (আল্লাহ) আরশের ওপর সমুন্নত।”(ত্বহা ২০:৫)

৩. যখন ইসতিওয়া শব্দটি “إلي” অব্যয়ের সাথে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে ইচ্ছা করা। যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তারপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন। (তাফসীরে সা‘দী, পৃ. ২৫)

(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

‘আর তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।’অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান সকল সৃষ্টি বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ)

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, ভালোভাবে অবগত।”

আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সূরা হা-মীম সিজদায় দিয়েছেন: “বল: তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু’দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি ভূ-পৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন (অটল) পর্বতমালা এবং তাতে রেখেছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে (এতে উত্তর) রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রবিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললোঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। অতঃপর তিনি তাকে দু’দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি দুনিয়ার আকাশকে বাতিসমূহ দিয়ে সুশোভিত ও সুরক্ষিত করলাম । এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।”(সূরা হা-মীম- সিজদাহ ৪১:৯-১২)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাত ধরেন অতঃপর বললেন: আল্লাহ তা‘আলা শনিবার মাটি সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় সষ্টি করেছেন রবিবার এবং বৃক্ষরাজী সৃষ্টি করেছেন সোমবার এবং অপছন্দনীয় জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবার, আলো সৃষ্টি করেছেন বুধবার, বৃহস্পতিবার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং শুক্রবার আসরের পর রাতের পূর্বে শেষ সময়ে তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা: ২১৪৯-৫০)

সাত আকাশের তাৎপর্য কি? সাত আকাশ বলতে কি বুঝায়? এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া কঠিন। মানুষ প্রতি যুগে আকাশ বা অন্য কথায় পৃথিবীর বাইরের জগত সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ ও ধারণা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের অনুসারী হয়েছে। এ চিন্তা ও মতবাদগুলো বিভিন্ন সময় বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এর মধ্য থেকে কোন একটি মতবাদ নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে কুরআনের এই শব্দগুলোর অর্থ নির্ণয় করা ঠিক হবে না। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, সম্ভবত পৃথিবীর বাইরে যতগুলো জগত আছে সবগুলোকেই আল্লাহ সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন অথবা এই বিশ্ব-জাহানের যে স্তরে পৃথিবীর অবস্থিতি সেটি সাতটি স্তর সমন্বিত।

এই বাক্যটিতে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গতিবিধি ও কর্মকান্ডের খবর রাখেন এবং যার দৃষ্টি থেকে তোমাদের কোন গতিবিধিই গোপন থাকতে পারে না তাঁর মোকাবিলায় তোমরা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করার সাহস কর কেমন করে? দুই, যে আল্লাহ যাবতীয় সত্য জ্ঞানের অধিকারী, যিনি আসলে সমস্ত জ্ঞানের উৎস তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তোমাদের আর কি লাভ হতে পারে! তিনি ছাড়া যখন জ্ঞানের আর কোন উৎস নেই, তোমাদের জীবনের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখার জন্য যখন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে আলো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে তোমরা নিজেদের জন্য এমন কি কল্যাণ দেখতে পেলে?

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হারাম হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত জাগতিক সকল বস্তু হালাল।

২. সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞানায়ত্বে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৩০

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

আবার৩৬ সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ কর যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, “আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা- প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই।” তারা বললো, “আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে চান যে সেখানকার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্থ করবে এবং রক্তপাত করবে?আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি।” আল্লাহ বললেন, “আমি জানি যা তোমরা জানো না।”

৩০ নং আয়াতের তাফসীর:

এখান থেকে মানব জাতির পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি ও তাঁর মর্যাদার আলোচনা সূচনা করা হয়েছে-

خليفة (খলীফাহ) শব্দটি خلف থেকে গৃহীত। অর্থ: একজনের পর অপরজন আসা, একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

(هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَا۟ئِفَ فِي الْأَرْضِ)

“তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন।”(সূরা ফাতির ৩৫:৩৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ)

“অতঃপর একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে উত্তরাধিকারী হয়।”(সূরা আ‘রাফ ৭:১৬৯, ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

মুফাসসিরগণ خليفة (খলীফাহ) শব্দের দু’টি ব্যখ্যা দিয়েছেন:

১. খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য আদম (আঃ)। কেননা তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ বাস্তবায়নে তাঁর খলীফা। আবার বলা হয় পূর্বে যে সকল জিন জমিনে বসবাস করত তিনি তাদের খলীফা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খলীফা দ্বারা আদম (আঃ) উদ্দেশ্য।

২. خليفة (খলীফাহ) শব্দটি একবচন হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বহুবচন অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতি। এ মতটি ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) প্রাধান্য দিয়েছেন।

যদিও খলীফা শব্দটি উভয় তাফসীরের সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বিতীয় তাফসীরের মতকে সমর্থন করে। অর্থাৎ খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য আদম ও তাঁর বংশধর, শুধু আদম (আঃ) নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ)

আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে বিবাদ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?

এটা জানা কথা যে, আদম (আঃ) ফাসাদকারী নন এবং রক্তপাতকারীও নন। যেমন পূর্বের আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়। (আযওয়াউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭০)

আল্লাহ তা‘আলা যখন ফেরেশতাদের কাছে খলীফা সৃষ্টির কথা বললেন তখন ফেরেশতাগণ বলল-

আপনি এমন ব্যক্তিদের সৃষ্টি করবেন যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, রক্তপাত ঘটাবে?

তাদের এ প্রশ্নের অর্থ এটা নয় যে, তারা গায়েব জানে। বরং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হবে। এজন্য তারা ঐ মন্তব্য করেছিল।

অথবা খলীফা শব্দের অর্থ জেনেই তারা এটা বুঝেছিল যে, মানুষ হবে ন্যায়-অন্যায়ের ফায়সালাকারী, অনাচার প্রতিহতকারী, অবৈধ ও পাপ কাজের বাধাদানকারী; ফলে তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং রক্তপাত ঘটবে।

অথবা পূর্বে যারা পৃথিবীতে বসবাস করেছিল তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখেই তারা মানুষের ব্যাপারেও এ মন্তব্য করেছিল।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের এ আরয প্রতিবাদমূলক ছিল না এবং আদম (আঃ)-এর প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে বলেছিল তাও নয়। কারণ ফেরেশতাগণ এরূপ চরিত্র থেকে পবিত্র।

ফেরেশতাদের আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনে এসেছে-

(لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ)

"তারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হন তাই করেন।" (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের সামনে বিষয়টি উত্থাপনের উদ্দেশ্য হল, শুধু এর হিকমত জানাবার ও এর রহস্য প্রকাশ করার, যা ছিল তাদের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলা তো ভালভাবেই জানেন যে, এরা বিবাদ ও ঝগড়াটে হবে, কাজেই তারা আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খলীফাসৃষ্টি করার পিছনে আপনার হিকমাত কী? যদি ইবাদত-ই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা তো আপনার ইবাদত করছি, আপনার প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে সর্বদা রত রয়েছি এবং আমরা ঝগড়া-বিবাদ হতেও পূতপবিত্র, তারপরও আল্লাহ তা'আলার খলীফা সৃষ্টি করার পেছনে কী হিকমত রয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই আমি জানি যা তোমরা জানো না। আমি জানি তাদের মধ্যে নাবী-রাসূল, সত্যবাদী, শহীদ, সৎ বান্দা ইত্যাদি হবে। তারা এমন ইবাদত করবে যা তারা ছাড়া অন্যরা করবে না। যেমন জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদত। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের নিকট দিনের ফেরেশতা ও রাতের ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে। অতঃপর তারা উভয় দল ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হয়। আল্লাহ তা'আলা (দিনের) ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন্ অবস্থায় রেখে এসেছ? তারা বলে, আমরা যখন তাদের নিকট আগমন করেছি তখন তাদেরকে পেয়েছি সালাতরত অবস্থায় এবং আমরা যখন তাদেরকে রেখে এসেছি তখনও তাদেরকে পেয়েছি সালাতরত অবস্থায়। (সহীহ বুখারী হা: ৬৯৯২, ৭০৪৮)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে একমুষ্ঠি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যে মাটি তিনি সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ হতে নিয়েছিলেন। তাই আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতি অনুসারে হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ এ সকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়ে থাকে। অনুরূপ কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ সৎ ও কেউ অসৎ প্রকৃতির হয়ে থাকে। (তিরমিযী, সিলসিলাতুস সহীহাহ হা: ১৬৩০)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: এ আয়াতটি খলীফা বা ইমাম নিযুক্ত করার মূল দলীল। রাষ্ট্রের সকল মানুষ নিযুক্ত খলীফা বা ইমামের আনুগত্যশীল থাকবে, যাতে ইমামের মাধ্যমে সকলে ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং ইমাম শরয়ী বিধান কায়িম করতে পারেন। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

ইসলামী নেতা বা খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহঃ

১. পূর্ববর্তী ইমাম বা খলীফার ঘোষণার মাধ্যমে যেমন: অমুক পরবর্তী ইমাম হবে। তাহলে এ কথা দ্বারাই সে ব্যক্তি ইমাম নিযুক্ত হয়ে যাবে। এ পদ্ধতিতে ওমার (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন।

২. কোন ব্যক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রের বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের একমত হওয়া যে, তিনি আমাদের ইমামের উপযুক্ত, আমরা তার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করব। কতক আলেম বলেন: আবূ বকর (রাঃ) এ পদ্ধতিতে ইমাম হয়েছেন। আনসার ও মুহাজির সকলে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতের ব্যাপারে একমত ছিলেন, যদিও প্রথম দিকে মতানৈক্য হয়েছিল।

৩. অনুরূপ খলীফা কয়েক সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে যাবেন, তারা নিজেদের মধ্যে বা বাইরে থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করবেন সে খলীফা বলে বিবেচিত হবেন।

৪. জালিম শাসক থেকে জোর করে খেলাফতের দায়িত্ব কেড়ে নেয়া। যোগ্য ইমাম বা নেতার জন্য অনেক শর্ত রয়েছে, বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। (তাফসীর কুরতুবী ১/২২৩-২২৮)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করে বললেন, যাও ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে সালাম কর। আর তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয় তা শ্রবণ কর। এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি গিয়ে বললেন, السلام عليكم তারা উত্তরে বলল, السلام عليك ورحمة الله।

তারা ورحمة الله অংশটি বেশি বলল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আদমের আকৃতিতে জান্নাতে যাবে এবং তার উচ্চতা হবে ষাট হাত। তখন হতে ক্রমান্বয়ে আদম সন্তানের উচ্চতা কমে আসছে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩২৬, মুসলিম হা: ৭৩৪২, মিশকাত হা: ৪৪২৩)

ওপরের রুকু’তে আল্লাহর বন্দেগী করার আহবান জানানো হয়েছিল। এ আহবানের ভিত্তিভূমি ছিল নিম্নরূপঃ আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর হাতেই তোমাদের জীবন ও মৃত্যু। যে বিশ্ব-জগতে তোমরা বাস করছো তিনিই তার একচ্ছত্র অধিপতি ও সার্বভৌম শাসক। কাজেই তাঁর বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি তোমাদের জন্য সঠিক নয়। এখন এই রুকূ’তে অন্য একটি ভিত্তি ভূমির ওপর ঐ একই আহবান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এই দুনিয়ায় আল্লাহ তোমাদেরকে খলীফা পদে অভিষিক্ত করেছেন। খলীফা হবার কারণে কেবল তাঁর বন্দেগী করলেই তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং এই সঙ্গে তাঁর পাঠানো হিদায়াত ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী জীবন যাপনও করতে হবে। আর যদি তোমরা এমনটি না কর তোমাদের আদি শত্রু শয়তানের ইঙ্গিতে চলতে থাকো, তাহলে তোমরা নিকৃষ্ট পর্যায়ের বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এ জন্য তোমাদের চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।এ প্রসঙ্গে মানুষের স্বরূপও বিশ্ব-জগতে তার মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসের এমন অধ্যায়ও উপস্থাপন করা হয়েছে যে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম মানুষের করায়ত্ত নেই। এই অধ্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লাভ করা হয়েছে তা প্রত্নতাত্বিক পর্যায়ে মাটির তলদেশ খুড়ে বিক্ষিপ্ত অস্থি ও কংকাল একত্র করে আন্দাজ – অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্কে স্থাপনের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

এখানে মূল আরবী শব্দ ‘মালাইকা’ হচ্ছে বহুবচন। একবচন ‘মালাক’। মালাক –এর আসল মানে “বাণীবাহক।” এরই শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে ‘যাকে পাঠানো হয়েছে’ বা ফেরেশতা। ফেরেশতা নিছক কিছু কায়াহীন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তাদের খেদমত নিয়ে থাকেন। তাদেরকে আল্লাহর বিশাল

সাম্রাজ্যের কর্মচারী বলা যায়। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও কাজ-কারবারে অংশীদার মনে করে। কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহর আত্মীয়। এ জন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে।

যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই অর্পিত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ব্যবহার করে তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয় বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন, তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হয় তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।

এটা ফেরেশতাদের আপত্তি ছিল না। বরং এটা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। আল্লাহর কোন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার অধিকারই ফেরেশতাদের ছিল না। 'খলীফা' শব্দটি থেকে তারা অবশ্যি এতটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, পরিকল্পনায় উল্লেখিত সৃষ্টজীবকে, দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা-ইখতিয়ার দান করা হবে। তবে বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্য আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আওতাধীনে কোন স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীব কিভাবে অবস্থান করতে পারে—একথা তারা বুঝতে পারছিল না। এই সাম্রাজ্যের কোন অংশে কাউকে যদি সামান্য কিছু স্বাধীন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে সেখানকার ব্যবস্থাপনা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, একথা তারা বুঝতে চাইছিল।

এই বাক্যে ফেরেশতারা একথা বলতে চায়নি যে, খিলাফত তাদেরকে দেয়া হোক কারণ তারাই এর হকদার। বরং তাদের বক্তব্যের অর্থ ছিলঃ "হে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ! আপনার হুকুম পালন করা হচ্ছে। আপনার মহান ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত বিশ্ব-জাহানকে আমরা পাক পবিত্র করে রাখছি। আর এই সাথে আপনার প্রশংসাগীত গাওয়া ও স্তব-স্তুতি করা হচ্ছে। আমরা আপনার খাদেমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার তাসবীহ পড়ছি তাহলে এখন আর কিসের অভাব থেকে যায়? একজন খলীফার প্রয়োজন দেখা দিল কেন? এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। (তাসবীহ শব্দটির দুই অর্থ হয়। এর একটি অর্থ যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় তেমনি অন্য একটি অর্থ হয় তৎপরতার সাথে কাজ করা এবং মনোযোগ সহকারে প্রচেষ্টা চালানো। ঠিক এভাবেই তাকদীস শব্দটিরও দুই অর্থ হয়। এক, পবিত্রতার প্রকাশ ও বর্ণনা এবং দুই, পাক-পবিত্র করা।)

এটি হচ্ছে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব। বলা হয়েছে, খলীফা নিযুক্ত করার কারণ ও প্রয়োজন আমি জানি, তোমরা তা বুঝতে পারবে না। তোমরা নিজেদের যে সমস্ত কাজের কথা বলছো, সেগুলো যথেষ্ট নয়। বরং এর চাইতেও বেশী আরো কিছু আমি চাই। তাই পৃথিবীতে ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি জীব সৃষ্টি করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানব জাতির পিতা আদম (আঃ)-এর সূচনা ও সৃষ্টি রহস্য জানলাম।

২. ফেরেশতারাও গায়েব জানেনা, গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য।

৩. ফেরশতাদের বৈশিষ্ট্য জানলাম। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়না, যা নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।

৪. মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতি ও স্বভাবের হওয়ার কারণ অবগত হলাম।

৫. খলীফা নিযুক্তির হিকমত ও পদ্ধতি জানতে পারলাম।